

রমায়ানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায় - মানুষের শ্রেণীভেদে রোযা রাখার হুকুম

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

(৭) রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য ব্যক্তি

কোন মৃত্যু-কবলিত মানুষকে আগুন, পানি বা ধ্বংসস্তুপ থেকে বাঁচাতে যদি কোন রোযাদারকে রোযা ভাঙ্গতে হয় এবং সে ছাড়া অন্য কোন রোযাহীন লোক না পাওয়া যায়, তাহলে প্রাণ রক্ষার জন্য তার পক্ষে রোযা ভাঙ্গা ওয়াজেব। অবশ্য সে ঐ দিনটিকে পরে কাযা করতে বাধ্য।[1]

তবে এ ব্যাপারে প্রশস্ততা বৈধ নয়। বরং কেবল অতি প্রয়োজনীয় ও একান্ত নিরুপায়ের ক্ষেত্রে দরকার মোতাবেক এ অনুমোদন প্রয়োগ করা উচিত। বিশেষ করে যাঁরা ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করেন, তাঁদের জন্য একান্ত কঠিন কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়। অন্যথা কোন আগুন নিভাতে যাওয়াই তাঁদের জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ করতে পারে না।[2]

যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় প্রচণ্ড ক্ষুধা অথবা পানি-পিপাসায় কাতর হয়ে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা করে, অথবা ভুল ধারণায় নয়, বরং প্রবল ধারণায় বেহুশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে, সে ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে প্রয়োজন মত পানাহার করতে পারে। তবে সে রোযা তাকে পরে কাযা করতে হবে। কারণ, জান বাঁচানো ফরয। আর মহান আল্লাহ বলেন,

(وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)

“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।” (কুরআনুল কারীম ২/১৯৫)

(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

“তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।” (কুরআনুল কারীম ৪/২৯)

কোন ধারণাপ্রসূত কষ্ট, ক্লান্তি অথবা রোগের আশঙ্কায় রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়।

যারা কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে তাদের জন্যও রোযা ছাড়া বৈধ নয়। এ শ্রেণীর লোকেরা রাত্রে রোযার নিয়ত করে রোযা রাখবে। অতঃপর দিনের বেলায় কাজের সময় যদি নিশ্চিত হয় যে, কাজ ছাড়লে তাদের ক্ষতি এবং কাজ করলে তাদের প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহলে তাদের জন্য রোযা ভেঙ্গে কেবল ততটুকু পানাহার বৈধ হবে, যতটুকু পানাহার করলে তাদের জান বেঁচে যাবে। অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর পানাহার করবে না। অবশ্য রমায়ান পরে তারা ঐ দিনটিকে কাযা করতে বাধ্য হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ বিধান হল,

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সাধের অতীত ভার অর্পণ করেন না। (কুরআনুল কারীম ২/২৮৬)

(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)

অর্থাৎ, আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। (কুরআনুল কারীম ৫/৬, ২২/৭৮)

বলা বাহুল্য, উঁট বা ছাগল-ভেঁড়ার রাখাল রৌদ্রে বা পিপাসায় যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে যতটুকু পরিমাণ পানাহার করা দরকার ততটুকু করে বাকী দিনটুকু সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকবে। অতঃপর রমায়ান বিদায় নিলে ঐ দিনটি কাযা করবে। আর এর জন্য কোন কাঙ্ক্ষা নেই।[3]

অনুরূপ বিধান হল চাষী ও মজুরদের।[4]

পক্ষান্তরে যাদের প্রাত্যহিক ও চিরস্থায়ী পেশাই হল কঠিন কাজ; যেমন পাথর কাটা বা কয়লা ইত্যাদির খনিতে যারা কাজ করে এবং যারা আজীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত, তারা রোযা রাখতে অপারগ হলে তথা অস্বাভাবিক কষ্ট অনুভব করলে রোযা না রাখতে পারে। তবে তাদের জন্য (তাদের পরিবার দ্বারা) ফিদ্যা আদায় (একটি রোযার বদলে একটি মিসকীনকে খাদ্য দান) করা জরুরী। অবশ্য এ কাজ সম্ভব না হলে তাও তাদের জন্য মাফ।[5]

পরীক্ষার সময় মেহনতী ছাত্রদের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ নয়। কারণ, এটা কোন এমন শরয়ী ওযর নয়, যার জন্য রোযা কাযা করা বৈধ হতে পারে।[6]

1. দিন যেখানে অস্বাভাবিক লম্বা:

যে দেশে দিন অস্বাভাবিকভাবে ২০/২১ ঘণ্টা লম্বা হয়, সে দেশের লোকেদের জন্যও রোযা ত্যাগ করা অথবা সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করা বৈধ নয়। তাদের যখন দিন-রাত হয়, তখন সেই অনুসারে তাদের জন্য আমল জরুরী; তাতে দিন লম্বা হোক অথবা ছোট। কেননা, ইসলামী শরীয়ত সকল দেশের সকল মানুষের জন্য ব্যাপক। আর মহান আল্লাহ ঘোষণা হল,

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

কিন্তু যে ব্যক্তি দিন লম্বা হওয়ার কারণে, অথবা নিদর্শন দেখে, অভিজ্ঞতার ফলে, কোন বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মতে, কিংবা নিজের প্রবল ধারণা মতে এই মনে করে যে, রোযা রাখতে তার প্রাণ নাশ ঘটবে, অথবা বড় রোগ দেখা দেবে, অথবা রোগ বৃদ্ধি পাবে, অথবা আরোগ্য লাভে বিলম্ব হবে, সে ব্যক্তি ততটুকু পরিমাণ পানাহার করবে যতটুকু পরিমাণ করলে তার জান বেঁচে যাবে অথবা ক্ষতি দূর হয়ে যাবে। অতঃপর রমায়ান বিদায় নিলে সুবিধা মত যে কোন মাসে ঐ দিনগুলো কাযা করে নেবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। কিন্তু কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কিছু চান না। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

তিনি আরো বলেন,

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করেন না। (কুরআনুল কারীম ২/২৮৬)

(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)

অর্থাৎ, আল্লাহ ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। (কুরআনুল কারীম ৫/৬, ২২/৭৮)

যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করে, যেখানে গ্রীষ্মকালে সূর্য অস্তই যায় না এবং শীতকালে উদয়ই হয় না, অথবা যেখানে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি থাকে, সে ব্যক্তির উপরেও রমাযানের রোযা ফরয। সে ব্যক্তি নিকটবর্তী এমন কোন দেশের হিসাব অনুযায়ী রমাযান মাসের শুরু ও শেষ, প্রাত্যহিক সেহরীর শেষ তথা ফজর উদয় হওয়ার সময় ও ইফতার তথা সূর্যাস্তের সময় নির্ধারণ করবে, যে দেশে রাত দিনের পার্থক্য আছে। অতএব সেখানেও ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্রি নির্ণয় করতে হবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক এ কথা প্রমাণিত যে, একদা তিনি সাহাবাবর্গকে দাজ্জাল প্রসঙ্গে কিছু কথা বললেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সে কতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘চল্লিশ দিন; এক দিন এক বছরের সমান, একদিন এক মাসের সমান এবং একদিন এক সপ্তাহের সমান। বাকী দিনগুলো তোমাদের স্বাভাবিক দিনের মত।’ তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! যে দিনটি এক বছরের মত হবে, সে দিনে কি এক দিনের (৫ অঙ্ক) নামায পড়লে যথেষ্ট হবে?’ তিনি বললেন, ‘না। বরং তোমরা বছর সমান ঐ দিনকে স্বাভাবিক দিনের মত নির্ধারণ করে নিও।’[৭]

বলা বাহুল্য, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ঐ এক বছর সমান দিনকে একটি স্বাভাবিক দিন গণ্য করেননি; যাতে কেবল ৫ অঙ্ক নামায যথেষ্ট হবে। বরং তাতে প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টায় ৫ অঙ্ক নামায পড়া ফরয বলে ঘোষণা করেন। আর তাদেরকে তাদের স্বাভাবিক দিনের সময়ের দূরত্ব ও পার্থক্য হিসাব করে ঐ বছর সমান দিনকে ভাগ করতে আদেশ করেন। সুতরাং যে সকল মুসলিম সেই দেশে বাস করেন, যেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত লম্বা হয়, সেখানে তাঁরা তাঁদের নামাযের সময়ও নির্ধারণ করবেন। আর এ ব্যাপারে নির্ভর করবেন তাঁদের নিকটবর্তী এমন দেশের, যেখানে রাত-দিন স্বাভাবিকরূপে চেনা যায় এবং প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টায় শরয়ী চিহ্ন মতে ৫ অঙ্ক নামাযের সময় জানা যায়। আর তদনুরূপই রমাযানের রোযা নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, এ দিক থেকে রোযা ও নামাযের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।[৮]

ফুটনোট

[1] (ফাতাওয়া শায়খ ইবনে উযাইমীন ৬০পৃঃ)

[2] (ফাইযুর রাহীমির রাহমান, ফী আহকামি অমাওয়াইযি রামাযান ১৮৯পৃঃ)

[3] (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়াহ ২৪/৬৭, ১০০, ফাসিঃ মুসনিদ ১০১-১০২পৃঃ)

[4] (ফাসিঃ মুসনিদ ৬১পৃঃ)

[5] (আহকামুস সাওমি অল-ইতিক্যফ, আবু সারী মঃ আব্দুল হাদী ১২২পৃঃ)

[6] (ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ৮০পৃঃ, তাইঃ ৪৮পৃঃ)

[7] (মুসলিম ২৯৩৭নং)

[8] (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়াহ ১৪/১২৬, ১৬/১১০, ২৫/১১, ২৯, ৩৪, ইবনে উযাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ৯৭-৯৮পৃঃ, ৪৮ঃ ৪৯পৃঃ)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4026>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন